

ভিখারিণী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম প্রকাশ : ১৮৭৭

এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম ছোটগল্প।
রবীন্দ্রনাথের তখন বয়স মাত্র ১৬ বছর। বাংলা
ভাষায় লেখা প্রথম ছোটগল্পও এ গল্প।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাশ্মীরের দিগন্তব্যাপী জলদম্পর্শী শৈলমালার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরগুলি আঁধার আঁধার ঝোপঝাপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। এখানে সেখানে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষচ্ছায়ার মধ্য দিয়া একটি-দুইটি শীর্ণকায় চঞ্চল ক্রীড়শীল নির্ঝর গ্রাম্য কুটিরের চরণ সিক্ত করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলগুলির উপর দ্রুত পদক্ষেপ করিয়া এবং বৃক্ষচ্যুত ফুল ও পত্রগুলিকে তরঙ্গ তরঙ্গ উলটপালট করিয়া, নিকটস্থ সরোবরে লুটাইয়া পড়িতেছে। দূরব্যাপী নিস্তরঙ্গ সরসী— লাজুক উষার রক্তরাগে, সূর্যের হেমময় কিরণে, সন্ধ্যার স্তরবিন্যস্ত মেঘমালার প্রতিবিন্দে, পূর্ণিমার বিগলিত জ্যোৎস্নাধারায় বিভাসিত হইয়া শৈললক্ষ্মীর বিমল দর্পণের ন্যায় সমস্ত দিনরাত্রি হাস্য করিতেছে। ঘনবৃক্ষবেষ্টিত অন্ধকার গ্রামটি শৈলমালার বিজন ক্রোড়ে আঁধারের অবগুণ্ঠন পরিয়া পৃথিবীর কোলাহল হইতে একাকী লুকাইয়া আছে। দূরে দূরে হরিৎ শস্যময় ক্ষেত্রে গাভী চরিতেছে, গ্রাম্য বালিকারা সরসী হইতে জল তুলিতেছে, গ্রামের আঁধার কুঞ্জে বসিয়া অরণ্যের মিয়মাণ কবি বউকথাকও মর্মের বিষণ্ণ গান গাহিতেছে। সমস্ত গ্রামটি যেন একটি কবির স্বপ্ন।

এই গ্রামে দুইটি বালক বালিকার বড়েই প্রণয় ছিল। দুইটিতে হাত ধরাধরি করিয়া গ্রাম্যশ্রীর ক্রোড়ে খেলিয়া বেড়াইত; বকুলের কুঞ্জে কুঞ্জে দুইটি অঞ্চল ভরিয়া ফুল তুলিত; শুকতারা আকাশে ডুবিতে না ডুবিতে, উষার জলদমালা লোহিত না হইতে হইতেই সরসীর বক্ষে তরঙ্গ তুলিয়া ছিন্ন কমলদুটির ন্যায় পাশাপাশি সাঁতার দিয়া বেড়াইত। নীরব মধ্যাহ্নে স্নিগ্ধতরুচ্ছায় শৈলের সর্বোচ্চ শিখরে বসিয়া ষোড়শবর্ষীয় অমরসিংহ ধীর মৃদুলস্বরে রামায়ণ পাঠ করিত, দুর্দান্ত রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণ পাঠ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিত। দশমবর্ষীয়া কমলদেবী তাহার মুখের পানে স্থির হরিণনেত্র তুলিয়া নীরবে শুনিত, অশোকবনে সীতার বিলাপকাহিনী শুনিয়া পঙ্করেখা অশ্রুসলিলে সিক্ত করিত। ক্রমে গগনের বিশাল প্রাঙ্গণে তারকার দীপ জ্বলিলে, সন্ধ্যার অন্ধকার-অঞ্চলে জোনাকি ফুটিয়া উঠিলে, দুইটিতে হাত ধরাধরি করিয়া কুটিরে ফিরিয়া আসিত। কমলদেবী বড়ে অভিমানিনী ছিল; কেহ তাহাকে কিছু বলিলে সে অমরসিংহের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিত। অমর তাহাকে সান্ত্বনা দিলে, তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিলে, আদর করিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত কপোল চুম্বন করিলে, বালিকার সকল যন্ত্রণা নিভিয়া যাইত। পৃথিবীর মধ্যে তাহার আর কেহই ছিল না; কেবল একটি বিধবা মাতা ছিল আর স্নেহময় অমরসিংহ ছিল, তাহারাই বালিকাটির অভিমান সান্ত্বনা ও ক্রীড়ার স্থল।

বালিকার পিতা গ্রামের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বলিয়া সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত। সম্পদের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া এবং সম্ভ্রমের সুদূর চন্দ্রলোকে অবস্থান করিয়া কমল গ্রামের বালিকাদের সহিত কখনো মিশে নাই, বাল্যকাল হইতে তাহার সাধের সঙ্গী অমরসিংহের সহিত খেলিয়া বেড়াইত। অমরসিংহ সেনাপতি অজিতসিংহের পুত্র, অর্থ নাই কিন্তু উচ্চবংশজাত— এই নিমিত্ত কমল ও অমরের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। একবার মোহনলাল নামে একজন ধনীর পুত্রের সহিত কমলের বিবাহের প্রস্তাব হয়, কিন্তু কমলের পিতা তাহার চরিত্র ভালো নয় জানিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই।

কমলের পিতার মৃত্যু হইল। ক্রমে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া গেল। ক্রমে তাঁহার প্রস্তরনির্মিত অট্টালিকাটি আস্তে আস্তে ভাঙিয়া গেল। ক্রমে তাঁহার পারিবারিক সম্ভ্রম অল্পে অল্পে বিনষ্ট হইল এবং ক্রমে তাঁহার রাশি রাশি বন্ধু একে একে সরিয়া পড়িল। অনাথা বিধবা জীর্ণ অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া একটি ক্ষুদ্র কুটিরে বাস করিলেন। সম্পদের সুখময় স্বর্গ হইতে দারুণ দারিদ্র্যে নিপতিত হইয়া বিধবা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। সম্ভ্রম রক্ষা করিবার উপায় দূরে থাক্, জীবনরক্ষারও কোনো সম্ভল নাই— আদরিণী কন্যাটি কী করিয়া দারিদ্রদুঃখ সহ করিবে? স্নেহময়ী মাতা ভিক্ষা করিয়াও কমলকে কোনোমতে দারিদ্র্যের রৌদ্র ভোগ করিতে দেন নাই।

অমরের সহিত কমলের শীঘ্রই বিবাহ হইবে। বিবাহের আর দুই-এক সপ্তাহ অবশিষ্ট আছে। অমর গ্রামের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে কমলকে তাহার ভবিষ্যৎ-জীবনের কত কী সুখের কাহিনী শুনাইত— বড়ে হইলে দুইজনে ঐ শৈলশিখরে কত খেলা খেলিবে, ঐ সরসীর জলে কত সাঁতার দিবে, ঐ বকুলের কুঞ্জে কত ফুল তুলিবে, চুপিচুপি গম্ভীরভাবে তাহারই পরামর্শ

করিত। বালিকা অমরের মুখে তাহাদের ভবিষ্যৎ-ক্রীড়ার গল্প শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিহ্বল নেত্রে অমরের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। এইরূপে যখন এই দুইটি বালক-বালিকা কল্পনার অস্ফুট জ্যোৎস্নাময় স্বর্গে খেলা করিতেছিল তখন রাজধানী হইতে সংবাদ আসিল যে, রাজ্যের সীমায় যুদ্ধ বাধিয়াছে। সেনানায়ক অজিতসিংহ যুদ্ধে যাইবেন এবং যুদ্ধশিক্ষাদিবার জন্য তাঁহার পুত্র অমরসিংহকেও সঙ্গে লইবেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে, শৈলশিখরের বৃক্ষচ্ছায়ায় অমর ও কমল দাঁড়াইয়া আছে। অমরসিংহ কহিতেছেন, “কমল, আমি তো চলিলাম, এখন রামায়ণ শুনিবি কার কাছে।”

বালিকা ছলছল নেত্রে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

“দেখ কমল, এই অস্তমান সূর্য আবার কাল উঠিবে, কিন্তু তোর কুটিরদ্বারে আমি আর আঘাত দিতে যাইব না। তবে বল দেখি, আর কাহার সহিত খেলা করিবি।”

কমল কিছুই কহিল না, নীরবে চাহিয়া রহিল।

অমর কহিল, “সখী, যদি তোর অমর যুদ্ধক্ষেত্রে মরিয়া যায়, তাহা হইলে—”

কমল ক্ষুদ্র বাহু দুটিতে অমরের বক্ষ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল; কহিল, “আমি যে তোমাকে ভালোবাসি অমর, তুমি মরিবে কেন।”

অশ্রুসলিলে বালকের নেত্র ভরিয়া গেল; তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, “কমল, আয়, অন্ধকার হইয়া আসিতেছে— আজ এই শেষবার তোকে কুটিরে পৌঁছাইয়া দিই।”

দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া কুটিরের অভিমুখে চলিল। গ্রামের বালিকারা জল তুলিয়া গান গাইতে গাইতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে, বনশ্রেণীর মধ্যে অলক্ষিতভাবে একটির পর আর-একটি পাপিয়া গাহিয়া গাহিয়া সারা হইতেছে, আকাশময় তারকা ফুটিয়া উঠিল। অমর কেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে এই অভিমানে কমল কুটিরে গিয়া মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অমর অশ্রুসলিলে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

অমর পিতার সহিত সেই রাত্রেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিল। গ্রামের শেষ প্রান্তের শৈলশিখরোপরি উঠিয়া একবার ফিরিয়া চাহিল; দেখিল— শৈলগ্রাম জ্যোৎস্নালোকে ঘুমাইতেছে, চঞ্চল নির্ঝরিণী নাচিতেছে, ঘুমন্ত গ্রামের সকল কোলাহল স্তব্ধ, মাঝে মাঝে দুই-একটি রাখালের গানের অস্ফুট স্বর গ্রামশৈলের শিখরে গিয়া মিশিতেছে। অমর দেখিল কমলদেবীর লতাপাতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র কুটিরটি অস্ফুট জ্যোৎস্নায় ঘুমাইতেছে। ভাবিল ঐ কুটিরে হয়তো এতক্ষণে শূন্যহৃদয়া মর্মপীড়িতা বালিকাটি উপাধানে ক্ষুদ্র মুখখানি লুকাইয়া নিদ্রাশূন্য নেত্রে আমার জন্য কাঁদিতেছে। অমরের নেত্র অশ্রুতে পূরিয়া গেল।

অজিতসিংহ কহিলেন, “রাজপুত্র-বালক! যুদ্ধযাত্রার সময় কাঁদিতেছিস!”

অমর অশ্রু মুছিয়া ফেলিল।

শীতকাল। দিবা অবসান হইয়া আসিতেছে। গাঢ় অন্ধকারময় মেঘরাশি উপত্যকা শৈলশিখর কুটির বন নির্ঝর হৃদ শস্যক্ষেত্র একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, অবিশ্রান্ত বরফ পড়িতেছে, তরল তুষারে সমস্ত শৈল আচ্ছন্ন হইয়াছে, পত্রহীন শীর্ণ বৃক্ষসকল শ্বেত মস্তকে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান। দারুণ তীব্র শীতে হিমালয়গিরিও যেন অবসন্ন হইয়া গিয়াছে। এই শীতসন্ধ্যার বিষণ্ণ অন্ধকারের মধ্য দিয়া গাঢ় বাষ্পময় স্তম্ভিত মেঘরাশি ভেদ করিয়া, একটি স্নানমুখশ্রী ছিন্নবসনা দরিদ্রবালিকা অশ্রুসলিলে নেত্রে শৈলের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। তুষারে পদতল প্রস্তুরের ন্যায় অসাড় হইয়া গিয়াছে, শীতে সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, মুখ নীলবর্ণ, পার্শ্ব দিয়া দুই-একটি নীরব পাশু চলিয়া যাইতেছে। হতভাগিনী কমল করুণনেত্রে এক-একবার তাহাদের মুখের দিকে চাহিতেছে। কী বলিতে গিয়া বলিতেছে না, আবার অশ্রুসলিলে অঞ্চল সিক্ত করিয়া তুষারস্তরে পদচিহ্ন অঙ্কিত করিতেছে।

কুটিরে রুগ্ণা মাতা অনাহারে শয্যাগত। সমস্ত দিন বালিকা এক মুষ্টিও আহার করিতে পায় নাই, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। সাহস করিয়া ভীতিবিহ্বলা বালা কাহারও কাছে ভিক্ষা চাহিতে পারে নাই— বালিকা কখনও ভিক্ষা করে নাই, কী করিয়া ভিক্ষা করিতে হয় জানে না, কাহাকে কী বলিতে হয় জানে না। আলুলিত কুন্তলরাশির মধ্যে সেই ক্ষুদ্র করুণ মুখখানি দেখিলে, দারুণ শীত কম্পমান তাহার সেই ক্ষুদ্র দেহখানি দেখিলে, পাষণ্ড ও বিগলিত হইত।

ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত হইল। নিরাশ বালিকা ভগ্নহৃদয়ে শূন্য অঞ্চলে কুটিরে ফিরিয়া যাইতেছে— কিন্তু অসাড় পা আর উঠে না; অনাহারে দুর্বল, পথশ্রমে ক্লান্ত, নিরাশায় স্ত্রিয়মাণ, শীতে অবসন্ন বালিকা আর চলিতে পারে না, অবশ হইয়া পথপ্রান্তে তুষারশয্যায় শুইয়া পড়িল। শরীর ক্রমে আরও অবসন্ন হইতে লাগিল। বালিকা বুঝিল ক্রমে সে অবসন্ন হইয়া তুষারে চাপা পড়িয়া মরিবে। মাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; জোড়হস্তে কহিল, “মা ভগবতী, আমাকে মারিয়া ফেলিয়ো না, আমাকে রক্ষা করো, আমি মরিলে যে আমার মা কাঁদিবে, আমার অমর কাঁদিবে।”

ক্রমে বালিকা অচেতন হইয়া পড়িল। কমল আলুলিতকুন্তলে শিথিল-অঞ্চলে তুষারে অর্ধমগ্না হইয়া বৃক্ষচ্যুত মলিন ফুলটির মতো পথপ্রান্তে পড়িয়া রহিল। তুষারের উপর তুষার

পড়িতে লাগিল, বালিকার বন্ধের উপর তুষারের কণা পড়িতেছে ও গলিতেছে। এবং ক্রমে জমিয়া যাইতেছে। এই আঁধার রাত্ৰিতে একজন পান্থও পথ দিয়া যাইতেছে না। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। রাত্ৰি বাড়িতে লাগিল। বরফ জমিতে লাগিল। বালিকা একাকিনী শৈলপথে পড়িয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কমলের মাতা ভগ্ন কুটিরে রোগশয্যায় শয়ান। জীর্ণ গৃহ ভেদ করিয়া শীতের বাতাস তীব্রবেগে গৃহে প্রবেশ করিতেছে। বিধবা তৃণশয্যায় শুইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছেন। গৃহ অন্ধকার, প্রদীপ জ্বালিবার লোক নাই। কমল প্রাতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই। ব্যাকুল বিধবা প্রত্যেক পদশব্দে কমল আসিতেছে বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। কমলকে খুঁজিবার জন্য বিধবা কতবার উঠিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পারেন নাই। কত কী আশঙ্কায় আকুল হইয়া মাতা দেবতার নিকট কাতর ক্রন্দনে প্রার্থনা করিয়াছেন; অশ্রুজলে কতবার কহিয়াছেন, “আমি হতভাগিনী, আমার মরণ হইল না কেন। কখনও ভিক্ষা করিতে জানে না যে বালিকা, তাহাকেও আজ অনাথার মতো দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইতে হইল? ক্ষুদ্র বালিকা অধিক দূর চলিতে পারে না— সে এই অন্ধকারে, তুষারে, বৃষ্টিতে কী করিয়া বাঁচিবে।”

উঠিতে পারেন না— অথচ কমলকে দেখিতে পাইতেছেন না, বিধবা বন্ধে করাঘাত করিয়া অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। দুই-একজন প্রতিবাসী বিধবাকে দেখিতে আসিয়াছিল; বিধবা তাহাদের চরণ জড়াইয়া ধরিল সজল নয়নে কাতরভাবে মিনতি করিলেন, “আমার পথহারা কমল কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একবার তাহাকে খুঁজিতে যাও।”

তাহারা বলিল, “এই তুষারে, অন্ধকারে, আমরা ঘরের বাহিরে যাইতে পারি না।”

বিধবা কাঁদিয়া কহিলেন, “একবার যাও— আমি অনাথ, দরিদ্র, অর্থ নাই, তোমাদের কী দিব বলো। ক্ষুদ্র বালিকা, সে পথ চিনে না, সে আজ সমস্ত দিন কিছু খায় নাই— তাহাকে মাতার ক্রোড়ে আনিয়া দেও— ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন।”

কেহ শুনিল না। সে বৃষ্টিবজ্রে কে বাহির হইবে। সকলেই নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল।

ক্রমে রাত্ৰি বাড়িতে লাগিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুর্বল বিধবা ক্লান্ত হইয়া গিয়াছেন, নির্জীবভাবে শয্যায় পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে বাহিরে পদশব্দ শূনা গেল। বিধবা চকিত নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন, “কমল, মা, আইলি?”

একজন বাহির হইতে রক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “ঘরে কে আছে।”

গৃহ হইতে কমলের মাতা উত্তর দিলেন। সে শাখাদীপ হস্তে গৃহে প্রবেশ করিল এবং কমলের মাতাকে কী কহিল, শুনিবামাত্র বিধবা চীৎকার করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এ দিকে তুষারক্লিষ্ট কমল ক্রমে ক্রমে চেতন লাভ করিল, চক্ষু মেলিয়া চাহিল। দেখিল— একটি প্রকাণ্ড গুহা, ইতস্ততঃ বৃহৎ শিলাখণ্ড বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, গাঢ় ধূস্র মেঘে গুহা পূর্ণ, সেই মেঘের অন্ধকার ভেদ করিয়া শাখাদীপের আলোকদীপ্ত কতকগুলি কঠোর শ্মশ্রুপূর্ণ মুখ কমলের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। প্রাচীরে কুঠার কৃপাণ প্রভৃতি নানাবিধ অস্থলম্বিত আছে, কতকগুলি সামান্য গার্হস্থ্য উপকরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বালিকা সভয়ে চক্ষু নিম্নীলিত করিল।

আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল। একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কে তুমি।”

বালিকা উত্তর দিতে পারিল না, বালিকার বাহু ধরিয়া সবেগে নাজড়াইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, “কে তুমি।”

কমল ভীতিকম্পিত মৃদুস্বরে কহিল, “আমি কমল।”

সে মনে করিয়াছিল এই উত্তরেই তাহারা তাহার সমস্ত পরিচয় পাইবে।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, “আজ সন্ধ্যার দুর্যোগের সময় পথে ভ্রমণ করিতেছিলে কেন।”

বালিকা আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল। অশ্রুজলে কণ্ঠে কহিল, “আজ আমার মা সমস্ত দিন আহা করিতে পান নাই—”

সকলে হাসিয়া উঠিল— তাহাদের নিষ্ঠুর অটুহাস্যে গুহা প্রতিধ্বনিত হইল, বালিকার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, কমল সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল। দস্যুদের হাস্য বজ্রধ্বনির ন্যায় বালিকার বন্ধে গিয়া বাজিল; সে সভয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, “আমাকে আমার মায়ের কাছে লইয়া যাও।”

আবার সকলে মিলিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্রমে তাহারা কমলের নিকট হইতে তাহার বাসস্থান, পিতামাতার নাম, প্রভৃতি জানিয়া লইল।

অবশেষে একজন কহিল, “আমরা দস্যু, তুই আমাদের বন্দিনী। তোর মাতার নিকট বলিয়া পাঠাইতেছি, সে যদি নির্ধারিত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না দেয় তবে তোকে মারিয়া ফেলিব।”

কমল কাঁদিয়া কহিল, “আমার মা অর্থ কোথায় পাইবেন। তিনি অতি দরিদ্র। তাঁহার আর কেহ নাই— আমাকে মারিয়ো না, আমাকে মারিয়ো না, আমি কাহারও কিছু করি নাই।”

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল।

কমলের মাতার নিকটে একজন দূত প্রেরিত হইল। সে গিয়া কহিল, “তোমার কন্যা বন্দিনী হইয়াছে—আজ হইতে তৃতীয় দিবসে আমি আসিব— যদি পাঁচশত মুদ্রা দিতে পারো তবে মুক্ত করিয়া দিব, নচেৎ তোমার কন্যা নিশ্চিত হত হইবে।”

এই সংবাদ শুনিয়াই কমলের মাতা মূর্ছিত হইয়া পড়েন।

দরিদ্র বিধবা অর্থ পাইবেন কোথায়। একে একে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। বিবাহ হইলে কমলকে দিবেন বলিয়া কতকগুলি অলংকার রাখিয়া দিয়াছিলেন, সেগুলি বিক্রয় করিলেন। তথাপি নির্দিষ্ট অর্থের চতুর্থাংশও হইল না। আর কিছুই নাই। অবশেষে বন্ধের বস্ত্র মোচন করিলেন, সেখানে তাঁহার মৃত স্বামীর একটি অঙ্গুরীয়ক রাখিয়া দিয়াছিলেন—নমনে করিয়াছিলেন, সুখ হউক, দুঃখ হউক, দারিদ্র্যই বা হউক, কখনো সেটি ত্যাগ করিবেন না, চিরকাল বন্ধের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবেন— মনে করিয়াছিলেন, এই অঙ্গুরীয়কটি তাঁহার চিত্তানলের সঙ্গী হইবে—কিন্তু অশ্রময়নেত্রে তাহাও বাহির করিলেন।

সে অঙ্গুরীয়কটিও যখন তিনি বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার বুকের এক-একখানি অস্থিও ভাঙিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু কেহই কিনিতে চাহিল না।

অবশেষে বিধবা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এক দিন গেল, দুই দিন গেল, তিন দিন যায়, কিন্তু নির্দিষ্ট অর্থের অর্ধেকও সংগৃহীত হয় নাই। আজ সেই দস্যু আসিবে। আজ যদি তাহার হস্তে অর্থ দিতে না পারেন, তবে বিধবার সংসারের যে একমাত্র বন্ধন আছে তাহাও ছিন্ন হইবে।

কিন্তু অর্থ পাইলেন না। ভিক্ষা করিলেন, দ্বারে দ্বারে রোদন করিলেন, সম্পদের সময় যাহারা তাঁহার স্বামীর সামান্য অনুচর ছিল তাহাদের নিকটও অঞ্চল পাতিলেন— কিন্তু নির্দিষ্ট অর্থের অর্ধেকও সংগৃহীত হইল না।

ভয়বিহ্বলা কমল গুহার কারাগারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। সে ভাবিতেছে তাহার অমরসিংহ থাকিলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিত না। অমরসিংহ যদিও বালক, কিন্তু সে জানিত অমরসিংহ সকলই করিতে পারে। দস্যুরা তাহাকে মাঝে মাঝে ভয় দেখাইয়া যায়। দস্যুদের দেখিলেই সে ভয়ে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ফেলিত। এই অন্ধকার কালাগৃহে, এই নিষ্ঠুর দস্যুদিগের মধ্যে একজন যুবা ছিল। সে কমলের প্রতি তেমন কর্কশভাবে ব্যবহার করিত না। সে ব্যাকুল বালিকাকে স্নেহের সহিত কত কী কথা জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু কমল ভয়ে কোনো কথারই উত্তর দিত না, দস্যু কাছে সরিয়া বসিলে সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইত। ঐ যুবাটি দস্যুপতির পুত্র। সে একবার কমলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, দস্যুর সহিত বিবাহ করিতে কি তাহার কোনো আপত্তি আছে। এবং মাঝে মাঝে প্রলোভন দেখাইত যে, যদি কমল তাহাকে বিবাহ করে তবে সে তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবে। কিন্তু ভীরা কমল কোনো কথারই উত্তর দিত না। এক দিন গেল ও দুই দিন গেল, বালিকা সতয়ে দেখিল দস্যুরা মদ্যপান করিয়া ছুরিকা শানাইতেছে।

এ দিকে বিধবার গৃহে দস্যুদের দূত প্রবেশ করিল, বিধবাকে জিজ্ঞাসা করিল অর্থ কোথায়? বিধবা ভিক্ষা করিয়া যাহা-কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন সকলই দস্যুর পদতলে রাখিয়া কহিলেন, “আমার আর কিছুই নাই, যাহা-কিছু ছিল সকলই দিলাম, এখন তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি আমার কমলকে আনিয়া দেও।”

দস্যু সে মুদ্রাগুলি সক্রোধে ছড়াইয়া ফেলিল। কহিল, “মিথ্যা প্রতারণা করিয়া পার পাইবি না, নির্দিষ্ট অর্থ না দিলে নিশ্চয় আজি তোর কন্যা হত হইবে। তবে চলিলাম— আমাদের দলপতিকে বলিয়া আসি যে, নির্দিষ্ট অর্থ পাইবে না, তবে এখন নরশোণিতে মহাকালীর পূজা দেও।”

বিধবা কত মিনতি করিলেন, কত কাঁদিলেন, কিছুতেই দস্যুর পাষণ্ডহৃদয় গলাইতে পারিলেন না। দস্যু গমনোদ্যত হইলে কহিলেন, “যাইয়ো না, আর একটু অপেক্ষা করো, আমি আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।”

এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মোহনলালের সহিত কমলের বিবাহ প্রস্তাব হয়। কিন্তু তাহা সম্পন্ন না হওয়াতে মোহন মনে-মনে কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া আছে। কমলের সমুদয় বৃত্তান্ত মোহনলাল প্রাতেই শুনিত পাইয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কুলপুরোহিতকে ডাকাইয়া শীঘ্র বিবাহের উত্তম দিন আছে কি না

জিজ্ঞাসা করিলেন।

গ্রামের মধ্যে মোহনের ন্যায় ধনী আর কেহ ছিল না; অকুল বিধবা অবশেষে তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোহন উপহাসের স্বরে হাসিয়া কহিলেন, “এ কী অপূর্ব ব্যাপার! এত দিনের পর দরিদ্রের কুটিরে যে পদার্পণ হইল?”

বিধবা। উপহাস করিয়ো না। আমি দরিদ্র, তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি।

মোহন। কী হইয়াছে।

বিধবা আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন।

মোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তা, আমাকে কী করিতে হইবে।”

বিধবা। কমলের প্রাণরক্ষা করিতে হইবে।

মোহন। কেন, অমরসিংহ এখানে নাই?

বিধবা উপহাস বুঝিতে পারিলেন। কহিলেন, “মোহন, যদি বাসস্থান অভাবে আমাকে বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইত, অনাহারে ক্ষুধার জ্বলায় যদি পাগল হইয়া মরিতাম, তথাপি তোমার কাছে একটি তৃণও প্রার্থনা করিতাম না। কিন্তু আজ যদি বিধবার একমাত্র ভিক্ষা পূর্ণ না করো, তবে তোমার নির্ধুরতা চিরকাল মনে থাকিবে।”

মোহন। আইস, তবে তোমাকে একটি কথা বলি। কমল দেখিতে কিছু মন্দ নহে, আর তাহাকে যে আমার পছন্দ হয় নাই এমনো নহে, তবে তাহার সহিত আমার বিবাহের আর তো কোনো আপত্তি দেখিতেছি না। তোমার কাছে ঢাকিয়া কী করিব, বিনা কারণে ভিক্ষা দিবার মতো আমার অবস্থা নহে।

বিধবা। অগ্রেই যে অমরের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

মোহন কিছু উত্তর না দিয়া হিসাবের খাতা খুলিয়া লিখিতে বসিলেন। যেন কেহই ঘরে নাই, যেন কাহারও সহিত কিছু কথা হয় নাই। এ দিকে সময় বহিয়া যায়, দস্যু আছে কি গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। বিধবা কাঁদিয়া কহিলেন, “মোহন, আর আমাকে যন্ত্রণা দিয়ো না, সময় অতীত হইতেছে।”

মোহন। রোসো, কাজ সারিয়া ফেলি।

অবশেষে যদি বিধবা বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে সমস্ত দিনে কাজ সারা হইত কি না সন্দেহস্থল। বিধবা মোহনলালের নিকট অর্থ লইয়া দস্যুকে দিলেন, সে চলিয়া গেল। সেই দিনই ভয়ে আশঙ্কায় ব্রহ্মা হরিণীটির ন্যায় বিহ্বলা বালিকা মাতার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল এবং তাঁহার বাহুপাশে মুখখানি প্রচ্ছন্ন করিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনের বেগ শান্ত করিল।

কিন্তু অনাথিনী বালিকা এক দস্যুর হস্ত হইতে আর-এক দস্যুর হস্তে পড়িল।

কত বৎসর গত হইয়া গেল। যুদ্ধের অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে। সৈনিকেরা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে ও অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ভূমি কর্ষণ করিতেছে। বিধবা সংবাদ পাইলেন যে, অজিতসিংহ হত ও অমর কারারুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কন্যাকে এ সংবাদ শুনান নাই।

মোহনের সহিত বালিকার বিবাহ হইয়া গেল।

মোহনের ক্রোধ কিছুমাত্র নিবৃত্ত হইল না। তাহার প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি বিবাহ করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। সে নির্দোষী অবলা বালার প্রতি অনর্থক পীড়ন করিত। কমল মাতৃক্রোড়ের স্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়া হইতে এই নির্ধুর কারণে আসিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, অভাগিনী কাঁদিতোও পায় না। বিন্দুমাত্র অশ্রু নৈত্রে দেখা দিলে মোহনের ভর্ৎসনার ভয়ে ব্রহ্ম হইয়া মুছিয়া ফেলিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শৈলশিখরের নিষ্কলঙ্ক তুষারদর্পণের উপর উষার রক্তিম মেঘমালা স্তরে স্তরে সজ্জিত হইল। ঘুমন্ত বিধবা দ্বারে আঘাত শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, সৈনিকবেশে, অমরসিংহ দাঁড়াইয়া আছেন। বিধবা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অমর তাজতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কমল, কমল কোথায়।”

শুনিলেন, স্বামীর আলয়ে।

মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি কত কী আশা করিয়াছিলেন— ভাবিয়াছিলেন কত দিনের পর দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন, যুদ্ধের উন্নত ঝটিকা হইতে প্রণয়ের শান্তিময় স্নিগ্ধ নীড়ে ঘুমাইতে যাইতেছেন, তিনি যখন অতর্কিতভাবে দ্বারে গিয়া দাঁড়াইবেন তখন হর্ষবিহ্বলা কমল ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। বাল্যকালের সুখময় স্থান সেই শৈলশিখরের উপর বসিয়া কমলকে যুদ্ধ-গৌরবের কথা শুনাইবেন, অবশেষে কমলের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রণয়ের কুসুমকুঞ্জে সমস্ত জীবনসুখের স্বপ্নে কাটাইবেন। এমন সুখের কল্পনায় যে কঠোর বজ্র পড়িল, তাহাতে তিনি দারুণ অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মনে তাঁহার যতই তোলপাড় হইয়াছিল, প্রশান্ত মুখশ্রীতে একটিমাত্র রেখাও পড়ে নাই।

মোহন কমলকে তাহার মাতৃ-আলয়ে রাখিয়া বিদেশে চলিয়া গেলেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে কমল-পুষ্পকলিকাটি ফুটিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে কমল একদিন বকুলবনে মালা গাঁথিতে গিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই, দূর হইতেই শূন্যমনে ফিরিয়া আসিয়াছিল। আর-একদিন সে বাল্যকালের খেলনাগুলি বাহির করিয়াছিল— আর খেলিতে পারিল না, নিরাশায় নিবাস ফেলিয়া সেগুলি তুলিয়া রাখিল। অবলা ভাবিয়াছিল যে, যদি অমর ফিরিয়া আসে তবে আবার দুইজনে মালা গাঁথিবে, আবার দুইজনে খেলা করিবে। কতকাল তাহার বাল্যসখা অমরকে দেখিতে পায় নাই, মর্মপীড়িতা কমল এক-একবার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিত। এক-একদিন রাত্রিকালে গৃহে কমলকে কেহ দেখিতে পাইত না, কমল কোথায় হারাইয়া গিয়াছে—খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে তাহার বাল্যের ক্রীড়াঙ্গল সেই শৈলশিখরের উপর গিয়া দেখিত— স্নানবদনা বালিকা অসংখ্যতারাখচিত অনন্ত আকাশের পানে নেত্র পাতিয়া আলুলিতকেশে শুইয়া আছে।

মল মাতার জন্য, অমরের জন্য কাঁদিত বলিয়া মোহন বজেই রুষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাকে মাতৃ-আলয়ে পাঠাইয়া ভাবিল যে, ‘দিনকতক অর্থাভাবে কষ্ট পাক, তাহার পরে দেখিব কে কাহার জন্য কাঁদিতে পারে।’

মাতৃভবনে কমল লুকাইয়া কাঁদে। নিশীথবায়ুতে তাহার কত বিষাদের নিঃশ্বাস মিশাইয়া গিয়াছে, বিজন শয্যায় সে যে কত অশ্রুবারি মিশাইয়াছে, তাহা তাহার মাতা একদিনও জানিতে পারেন নাই।

একদিন কমল হঠাৎ শুনিল তাহার অমর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার কত দিনকার কত কী ভাব উথলিয়া উঠিল। অমরসিংহের বাল্যকালের মুখখানি মনে পড়িল। দারুণ যন্ত্রণায় কমল কতক্ষণ কাঁদিল। অবশেষে অমরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বাহির হইল।

সেই শৈলশিখরের উপরে সেই বকুলতরুচ্ছায়ায় মর্মহত অমর বসিয়া আছেন। এক-একটি করিয়া ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল। কত জ্যোৎস্নারাত্রি, কত অন্ধকার সন্ধ্যা, কত বিমল উষা, অস্ফুট স্বপ্নের মতো তাঁহার মনে একে একে জাগিতে লাগিল। সেই বাল্যকালের সহিত তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের অন্ধকারময় মরণভূমির তুলনা করিয়া দেখিলেন— সঙ্গী নাই, সহায় নাই, আশ্রয় নাই, কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে না, কেহ তাঁহার মর্মের দুঃখ শুনিয়া মমতা প্রকাশ করিবে না— অনন্ত আকাশে কক্ষচ্ছিন্ন জ্বলন্ত ধূমকেতুর ন্যায়, তরঙ্গকুল অসীম সমুদ্রের মধ্যে ঝটিকাতাড়িত একটি ভগ্ন ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায়, একাকী নীরব সংসারে উদাস হইয়া বেড়াইবেন।

ক্রমে দূর গ্রামের কোলাহলের অস্ফুট ধ্বনি থামিয়া গেল, নিশীথের বায়ু আঁধার বকুলকুঞ্জের পত্র মর্মরিত করিয়া বিষাদের গভীর গান গাহিল। অমর গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে, শৈলের সমুচ্চ শিখরে একাকী বসিয়া দূর নির্বারের মৃদু বিষণ্ণ ধ্বনি, নিরাশ হৃদয়ের দীর্ঘনিঃশ্বাসের ন্যায় সমীরণের হু—হু শব্দ, এবং নিশীথের মর্মভেদী একতানবাহী যে-একটি গভীর ধ্বনি আছে, তাহাই শুনিতেন। তিনি দেখিতেছিলেন অন্ধকারের সমুদ্রতলে সমস্ত জগৎ ডুবিয়া গিয়াছে, দুরন্ত শ্মশানক্ষেত্রে দুই-একটি চিতানল জ্বলিতেছে, দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত নীরন্ধ স্তম্ভিত মেঘে আকাশ অন্ধকার।

সহসা শুনিলেন উচ্ছ্বসিত স্বরে কে কহিল, “ভাই অমর”—

এই অমৃতময়, স্নেহময়, স্বপ্নময় স্বর শুনিয়া তাঁহার স্মৃতির সমুদ্র আলোড়িত হইয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিলেন—কমল। মুহূর্তের মধ্যে নিকটে আসিয়া বাহুপাশে তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া কহিল, “ভাই অমর”—

অচলহৃদয় অমরও অন্ধকারে অশ্রু বিসর্জন করিলেন, আবার সহসা চকিতের ন্যায় দূরে সরিয়া গেলেন। কমল অমরকে কত কী কথা বলিল, অমর কমলকে দুই-একটি উত্তর দিলেন। সরলা আসিবার সময়ে যেরূপ উৎফুল্লহৃদয়ে হাসিতে হাসিতে আসিয়াছিল, যাইবার সময় সেইরূপ ভ্রিয়মাণ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

কমল ভাবিয়াছিল সেই ছেলেবেলাকার অমর ফিরিয়া আসিয়াছে, আর আমি সেই ছেলেবেলাকার কমল কাল হইতে আবার খেলা করিতে আরম্ভ করিব। যদিও অমর মর্মের গভীরতলে সাংঘাতিক আহত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি কমলের উপর কিছুই ক্রুদ্ধ হন নাই বা অভিমান করেন নাই। তাঁহার জন্য বিবাহিত-বালিকার কর্তব্যকর্মে বাধা না পড়ে এই নিমিত্ত তিনি তাহার পরদিন কোথায় যে চলিয়া গেলেন তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না।

বালিকার সুকুমার হৃদয়ে দারুণ বজ্র পড়িল। অভিমানিনী কতদিন ধরিয়া ভাবিয়াছে যে, এত দিনের পর সে বাল্যসখা অমরের কাছে ছুটিয়া গেল, অমর কেন তাহাকে উপেক্ষা করিল। কিছুই ভাবিয়া পায় নাই। একদিন তাহার মাতাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মাতা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, কিছুকাল রাজসভার আড়ম্বররাশির মধ্যে থাকিয়া সেনাপতি অমরসিংহ পর্ণকুটিরবাসিনী ভিখারিনী ক্ষুদ্র বালিকাটিকে ভুলিয়া যাইবেন তাহাতে অসম্ভব কী আছে। এই কথায় দরিদ্র বালিকার অন্তরতম দেশে শেল বিঁধিয়াছিল। অমরসিংহ তাহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিল মনে করিয়া কমল কষ্ট পায় নাই। হতভাগিনী ভাবিত, ‘আমি দরিদ্র, আমার কিছুই নাই, আমার কেহই নাই, আমি বুদ্ধিহীনা ক্ষুদ্র বালিকা, তাঁহার চরণরেণুরও যোগ্য নহি, তবে তাঁহাকে ভাই বলিব কোন্

অধিকারে! তঁহাকে ভালোবাসিব কোন অধিকারে! আমি দরিদ্র কমল, আমি কে যে তঁহার স্নেহ প্রার্থনা করিব!’

সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটিয়া যায়, প্রভাত হইলেই সেই শৈলশিখরে উঠিয়া স্রিয়মাণ বালিকা কত কী ভাবিতে থাকে, তাহার মর্মের নিভৃত তলে যে বাণ বিদ্ধ হইয়াছিল তাহা যদিও সে মর্মেই লুকাইয়া রাখিয়াছিল— পৃথিবীর কাহাকেও দেখায় নাই— তথাপি ঐ মর্মে-লুকাইয়া রাখা ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ের শোণিত ক্ষয় করিতে লাগিল।

বালিকা আর কাহারও সহিত কথা কহিত না, মৌন হইয়া সমস্তদিন সমস্তরাত্রি ভাবিত। কাহারও সহিত মিশিত না। হাসিত না, কাঁদিত না। এক-একদিন সন্ধ্যা হইলেও দেখা যাইত পথপ্রান্তের বৃক্ষতলে মলিন ছিন্ন অঞ্চলে মুখ ঝাঁপিয়া দীনহীন কমল বসিয়া আছে। বালিকা ক্রমে দুর্বল ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। আর উঠিতে পারে না— বাতায়নে একাকিনী বসিয়া থাকিত, দেখিত দূর শৈলশিখরের উপর বকুলপত্র বায়ুভরে কাঁপিতেছে। দেখিত রাখালেরা সন্ধ্যার সময় উদাসভাবোদ্দীপক সুরে মৃদু মৃদু গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে।

বিধবা অনেক চেষ্টা করিয়াও বালিকার কষ্টের কারণ বুঝিতে পারেন নাই এবং তাহার রোগের প্রতিকার করিতেও পারেন নাই। কমল নিজেই বুঝিতে পারিত যে, সে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে। তাহার আর কোনো বাসনা ছিল না, কেবল দেবতার কাছে প্রার্থনা করিত যে ‘মরিবার সময় যেন অমরকে দেখিতে পাই’।

কমলের পীড় গুরুতর হইল। মূর্ছার পর মূর্ছা হইতে লাগিল। শিয়রে বিধবা নীরব, কমলের গ্রাম্য সঙ্গিনী বালিকারা চারি ধার ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দরিদ্র বিধবার অর্থ নাই যে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন। মোহন দেশে নাই এবং দেশে থাকিলেও তাহার নিকট হইতে কিছু আশা করিতে পারিতেন না। তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া কমলের পথ্যাদি যোগাইতেন। চিকিৎসকদের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা চাহিতেন যে, তাহারা কমলকে একবার দেখিতে আসুক। অনেক মিনতিতে চিকিৎসক কমলকে আজ রাত্রে দেখিতে আসিবে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

অন্ধকার রাত্রের তারাগুলি ঘোর নিবিড় মেঘে ডুবিয়া গিয়াছে, বজ্রের ঘোরতর গর্জন শৈলের প্রত্যেক গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং অবিরল বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ চকিতচ্ছটা শৈলের প্রত্যেক শৃঙ্গে শৃঙ্গে আঘাত করিতেছে। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। প্রচণ্ড বেগে ঝটিকা বহিতেছে। শৈলবাসীরা অনেক দিন এরূপ ঝড় দেখেন নাই। দরিদ্র বিধবার ক্ষুদ্র কটির টলমল করিতেছে, জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া বৃষ্টিধারা গৃহে প্রবাহিত হইতেছে এবং গৃহপার্শ্বে নিম্প্রভ প্রদীপশিখা ইতস্তত কাঁপিতেছে। বিধবা এই ঝড়ে চিকিৎসকের আসিবার আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

হতভাগিনী নিরাশহৃদয়ে নিরাশাব্যঞ্জক স্থির দৃষ্টিতে কমলের মুখের পানে চাহিয়া আছেন ও প্রত্যেক শব্দে চিকিৎসকের আশায় চকিত হইয়া দ্বারের দিকে চাহিতেছেন। একবার কমলের মূর্ছা ভাঙিল, মূর্ছা ভাঙিয়া মাতার মুখের দিকে চাহিল। অনেক দিনের পর কমলের চক্ষে জল দেখা দিল— বিধবা কাঁদিতে লাগিলেন, বালিকারা কাঁদিয়া উঠিল।

সহসা অশ্বের পদধ্বনি শুনা গেল, বিধবা শশব্যস্তে উঠিয়া কহিলেন চিকিৎসক আসিয়াছেন। দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে চিকিৎসক গৃহে প্রবেশ করিলেন। তঁহার আপাদমস্তক বসনে আবৃত, বৃষ্টিধারায় সিক্ত বসন হইতে বারিবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। চিকিৎসক বালিকার তৃণশয্যার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। অবশ বিষাদময় নেত্র চিকিৎসকের মুখের পানে তুলিয়া কমল দেখিল সে চিকিৎসক নয়, সে সেই সৌম্যগম্ভীরমূর্তি অমরসিংহ।

বিহ্বলা বালিকা প্রেমপূর্ণ স্থির দৃষ্টিতে তঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিশাল নেত্র ভরিয়া অশ্রু গজাইয়া পড়িল এবং প্রশান্ত হাস্যে কমলের বিবর্ণ মুখশ্রী উজ্জল হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই রুগ্ণ শরীরে অত আহ্লাদ সহিল না। ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত নেত্র নিমীলিত হইয়া গেল, ধীরে ধীরে বক্ষের কম্পন থামিয়া গেল, ধীরে ধীরে প্রদীপ নিভিয়া গেল। শোকবিহ্বলা সঙ্গিনীরা বসনের উপর ফুল ছড়াইয়া দিল। অশ্রুহীন নেত্রে, দীর্ঘশ্বাসশূন্য বক্ষে, অন্ধকারময় হৃদয়ে, অমরসিংহ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

শোকবিহ্বলা বিধবা সেই দিন অবধি পাগলিনী হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন এবং সন্ধ্যা হইলে প্রত্যহ সেই ভগ্নাবশিষ্ট কুটিরে একাকিনী বসিয়া কাঁদিতেন।